প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নিরিখে রবীন্দ্রনাটক

সৌমিত্র বসু

আলোচনা শুরু করার আগে নিরিখ শব্দটিকে একটু বুঝে নেওয়া দরকার। অভিধানে দেখছি, শব্দটি এসেছে ফারসি নির্‌খ্‌ থেকে, আভিধানিক অর্থ—মূল্যের হার, বাজার দর, দ্রব্যের মূল্য। বলা বাহুল্য, ঠিক এইরকম বাণিজ্যঘেঁষা অর্থে রবীন্দ্রনাটককে বিচার করতে চাইছি না আমরা, শব্দটির অনুষঙ্গ ধরে এর অর্থ করে নেওয়া যাক মাপকাঠি। তাহলে, আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মাপকাঠিতে রবীন্দ্রনাটকের বিচার করা। সেইসব মাপকাঠি বলতে কী বোঝায়, অর্থাৎ ঠিক কোন্ কোন্ দিক থেকে শিল্পকে বিচার করা সম্ভব? আমরা জানি, যে কোনও শিল্পকে মোটের ওপর বিচার করা যায় দু'ভাবে, বিষয় এবং তার প্রকাশভঙ্গি। যদি আর একটু ছড়িয়ে ভাবি তাহলে মনে হতে পারে, যে - কোনও শিল্পের মধ্যেই একটা সামাজিক আদানপ্রদানের পরিসর থাকে, সেটা হতে পারে শিল্পীর সঙ্গে তার উপভোক্তার আদানপ্রদান, হতে পারে চরিত্রদের সঙ্গে উপভোক্তার আদানপ্রদান, তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের নানা স্তর, স্রষ্টার সঙ্গে তার চরিত্রের আদানপ্রদান ইত্যাদি। নাটক এমন এক সংরূপ সাধারণত তা গড়ে ওঠে বহু চরিত্র ঘটনা নিয়ে, তাই সেখানে এই সামাজিক আদানপ্রদানের স্তর থাকার কথা প্রচুর। বিষয়ের সঙ্গে মিশে থাকে এক বা একাধিক মতাদর্শ, যার স্পষ্ট বা আবছায়া প্রকাশ ঘটে নাটকের মধ্যে। যে-কোনও শিল্প বা সাহিত্যের মধ্যে আর একটি উপাদান থাকে, স্রষ্টার মনের অবচেতনে তলিয়ে থাকা নানা ভাবনা বা দৃশ্যকল্পনার বিচিত্র রূপ হয়তো তাঁর অগোচরেই ঢুকে পড়ে রচনার মধ্যে। কী কথা বলা হচ্ছে এবং কেমন করে বলা হচ্ছে সেই ভাবনায় এদেরও গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন উনিশ শতকের বাঙলাদেশে, তাঁর স-জনভাবনার সবকটি স্তরে তাঁর দেশজ ঐতিহ্যের পাশাপাশি পাশ্চাত্য ধাঁচা চলে আসবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য নিরিখ বলতে কী বুঝব তাও আমাদের ঠিক করে নিতে হবে। তার আগে স্থির করে নেওয়া যাক, যাকে বলছি নিরিখ বা মাপকাঠি, ধাঁচা অথবা ইংরেজিতে মডেল শব্দও হয়তো ব্যবহার করা যায়, একজন সৃজনশীল মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী, তাঁর সৃজন প্রক্রিয়ায় কেমন করে তিনি একটি নিরিখকে গ্রহণ অথবা বর্জন করেন।

আমার চারপাশের জগৎ কখনও কখনও আমার মনের ভেতরে কতকগুলি প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে। সে প্রতিক্রিয়া হতে পারে বিরোধমূলক, হতে পারে মিলনমূলক। সেই প্রতিক্রিয়াকে ব্যক্তিগত স্তরে না রেখে তাকে আমি বহু মানুষের মন আর অনুভবগম্য করে তুলতে চাই, এমন কি স্থান বা কালের বাধাকে অতিক্রম করেও— এই হল শিল্পস-জন আকাঙ্ক্ষার মূল কথা। কেমন করে প্রকাশ করব তার কিছু ধাঁচা আছে, যাদের বলতে পারি সংরূপ। স-জনের সময়, সেই সংরূপের আইন কানুন আমাকে কখনও সাহায্য করতে পারে, কখনও দিতে পারে বাধা, আমার স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ার পথে দেওয়াল তুলে দাঁড়াতে পারে। সেক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিক্রিয়া আর সংরূপের দাবির মধ্যে শিল্পী একটা সমঝোতায় আসবার চেষ্টা করতে চান। সংরূপের আইনটা একধরনের প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশ, তাই এই সমঝোতাকে বলা যেতে পারে শিল্পী ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের টানাপোড়েন।

প্রাচীন বা মধ্যযুগে, যখন ব্যক্তির ওপর সমাজের অনুশাসন অনেক প্রবল ছিল, তখন শিল্পের ভালোমন্দ বিচারে এই আইনের প্রতাপ ছিল খুব বেশি, অ্যারিস্টটল থেকে ভরতমুনি, সকলেই সাহিত্য রচনার আইন বেঁধে দিতে চেয়েছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সংরূপের বাঁধা সড়ককে অস্বীকার করার প্রবণতা এল, যেমন এল প্রথাগত বিষয়কে না মানতে চাওয়ার চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের যুগের শিল্পী। এই প্রসঙ্গে আর একটি ছোট কথা বলে নিতে হবে। আমার ধারণা, প্রতিষ্ঠান বনাম ব্যক্তি - ইচ্ছার এই যুদ্ধে আম জনতার পক্ষপাত সাধারণত থাকে প্রতিষ্ঠানের দিকে, নাটকের বেলায় তো বিশেষ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন যে কোনও পেশাদার নাটককারের তুলনায় বিষয় এবং রূপ ভাবনায় এই প্রতিষ্ঠানিকতাকে অগ্রাহ্য করবার চেষ্টা করে গেছেন, এ কথাও মনে রাখা চাই।

নিরিখ বা মাপকাঠি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার লোভ সামলে, আমরা বরং রবীন্দ্রনাটকের দিকে তাকাই। ভাবতে মজা লাগে যে ছোটবেলায় জানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে তিনি যেমন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে শকুন্তলা অনুবাদের স্বাদ পেয়েছিলেন, তেমনি আবার ম্যাকবেথের অনুবাদও করেছিলেন, অর্থাৎ প্রাচ্য পাশ্চাত্য দু'ধরনের নাট্যরীতির সঙ্গেই তাঁর আশৈশব যোগাযোগ। তাঁর প্রথম নাটক 'রুদ্রচণ্ড', প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সালে, কিন্তু এর রচনাকাল সম্ভবত ১৮৭৭-৭৮ এর কাছাকাছি। সেখান থেকে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত 'নলিনী' পর্যন্ত পরীন্দ্রনাথ মোট পাঁচটি নাটক লিখেছেন। এদের মধ্যে 'বাল্মীকি প্রতিভা' আর 'কালমৃগয়া'র কাহিনি নেওয়া হয় রামায়ণ থেকে, কিন্তু রচনারীতির দিক থেকে এদের সঙ্গে হ্বাগনারিয় অপেরার মিল পাওয়া যাবে। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, বিলেত থেকে ফিরে কেমন করে তাঁর গায়ন-ভঙ্গিতে য়ুরোপীয় প্রভাব এসে পড়েছিল। বাল্মীকি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি প্রতিভা তাহা নহে— ইহা সুরে

নাটিকা'। আমার মতে, এই শব্দবন্ধটি হ্বাগনারের মিউজিক ড্রামার হুবহু বাঙলা। দেশজ আখ্যানে বিদেশি প্রকাশভঙ্গি ব্যবহার করার এই রীতি তখনকার সব সৃজনশীল মানুষই অনুসরণ করেছেন, রঙ্গলাল মধুসূদন জি.সি. গুপ্ত হরচন্দ্র ঘোষ অথবা প্যারীচাঁদ মিত্র। বাল্মীকি প্রতিভায় রবীন্দ্রনাথ যে হ্বাগনারের ধাচা ব্যবহার করলেন তার অন্যতম কারণ হয়তো এই যে স্বর্ণকুমারী জ্যোতিরিন্দ্রনাথদের প্রথাগত গীতিনাট্যে আখ্যান বা চরিত্রের নানা দোলাচল তীব্র করে উঠে আসে না, যাকে রবীন্দ্রনাথ নাটকীয়তা বলে মনে করেন। প্রসঙ্গত, ড. অরুণকুমার বসু জানিয়েছেন, ইংল্যান্ডে সম্ভবত স্যুলিভানের একটি অপেরা দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তার কাহিনিও এক দস্যুর হৃদয় পরিবর্তনকে নিয়ে, বাল্মীকি প্রতিভার আখ্যান নির্বাচনে তার ভূমিকাও থাকা সম্ভব। বাল্মীকি প্রতিভার সমকালে লেখা ভগ্নহৃদয়ের বিজ্ঞাপন অংশটি মনে করিয়ে দিই। 'ভগ্নহৃদয়' নাটকাকারে লেখা হলেও তা যে নাটক নয়, কবিতা, তা বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র এমন এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই।' কবি হতে চাওয়া এক বালক কেবলমাত্র সুন্দর নয়, নিজের দ্বিধা, বাধা, উৎসর্জন নিয়ে জীবনের সামূহিকতাকে প্রকাশ করতে চাইছে বাল্মীকির কাহিনির মধ্যে দিয়ে, নিজের জীবনকে প্রয়োগ করবার জন্যেই আখ্যান বর্ণনার এই বিদেশি রীতি তাঁকে টান দিয়েছিল। এই পর্বের বাকি তিনটি নাটক, রুদ্রচণ্ড,, প্রকৃতির প্রতিশোধ আর নলিনীর গড়ন একেবারেই তাঁর নিজস্ব। তারা প্রবলভাবে সমকালীন মধুসূদন দীনবন্ধুদের তো বটেই, এমন কি ঘরের মানুষ জ্যোতিদাদার বিষয় এবং প্রকাশরীতিকে প্রত্যাখ্যান করছে। নলিনী আগে লেখা কাব্য ভগ্নহৃদয়কে নিয়ে তৈরি, এর বিষয়ভাবনায় বৈষ্ণব পদাবলীর রাসলীলার সঙ্গে হয়তো য়ুরোপে দেখা এবং য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে বর্ণনা করা পার্টির ছবি উঠে এসেছে। কিন্তু যেটা বিশেষভাবে লক্ষ করতে বলি, নাটকগুলোর মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর একটা ছদ্মরূপ যেমন বেরিয়ে আসতে চায়, যা সমকালীন অন্য নাটককারদের লেখায় এতটা তীব্র আকুতি নিয়ে আসবে না।

১৮৮৪ থেকে ১৮৮৮ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নাটক লেখায় মন দেননি, ১৮৮৮ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত তিন বছরে প্রকাশিত হল তাঁর তিনটি নাটক, 'মায়ার খেলা', 'রাজা ও রানী' আর 'বিসর্জন'। বিশেষভাবে নজর করবার, এই পর্বে তিনি ফিরে আসছেন প্রথানুগত নাটক রচনার দিকে। মায়ার খেলা হ্বাগনারিয় ধরনে নাটক গড়ে তোলার ওপর জোর দিচ্ছে না, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ইহার আখ্যানভাগ কোনও সমাজবিশেষে দেশবিশেষে বদ্ধ নহে'। সংগীতের কল্পরাজ্যে সমাজনিয়মের প্রাচীর তুলিবার আবশ্যক বিবেচনা করি নাই'। রাজা ও রানী আর বিসর্জন শেক্সপীয়রিয় পঞ্চাঙ্ক নাটকের আদলে তৈরি, এ কথাও সকলেই জানি। যিনি বাঙলা নাট্যসাহিত্যের পক্ষে একেবারেই ভিন্ন ধাঁচায় নাটক লেখা শুরু করেছিলেন তিনি হঠাৎ প্রথার অনুবর্তী হলেন কেন: এমন হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তখন একজন প্রতিষ্ঠিত সামাজিক মানুষ সমাজ-স্বীকৃতও বটে, তাই প্রাতিষ্ঠানিক নাটক লেখার ধারাটি গ্রহণ করতে চাইলেন। চাইলেন, তবে পারলেন না। লক্ষ করতে বলব, নাটকগুলিকে অনবরত পালটাতে চাইছেন তিনি। বোঝা যাচ্ছে, এই পঞ্চাঙ্কে বিন্যস্ত, নাটকীয়তায় ভরা প্রকাশরীতির যান্ত্রিক প্রয়োগ পছন্দ হচ্ছে না তাঁর, 'চিত্রাঙ্গদা' বা 'মালিনী'তে বেরিয়ে এলেন সেই গড়ন থেকে। উনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের সূচনা পর্বে রবীন্দ্রনাথ কিছু মজার ছোট নাটক লিখছিলেন, যাদের প্রায় নকশা বলা যায়। ভূমিকায় জানাচ্ছেন, 'য়ুরোপে শারাড নামক কতকগুলি নাট্যলেখা প্রচলিত আছে। কতকটা তাহারি অনুকরণে এগুলি লেখা হয়'। এই নাটিকাগুলির দুটি বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দিতে চাই। প্রথম, হাস্যকৌতুকের লেখাগুলি প্রভূত জনপ্রিয়তা পেয়েছে শারাড হিসেবে নয়, এর অন্তর্লীন রহস্য ভেদ করবার আগ্রহ আমরা বোধ করিনি, এরা কিশোরভোগ্য মজার নাটক হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছে। জনপ্রিয়তার আর একটি বড় কারণ হল, এর মধ্যে উনিশ বিশ শতকের গ্রাম শহরের বাঙালি জীবন, মানুষের ছোট ছোট মানবিক দুর্বলতার এমন স্বাদু ছবি তৈরি করা হয়েছে, যার ফলে এদের নিছক কোনও একটি সংরূপের প্রয়োগ বলে ভাবতে ইচ্ছে করবে না।

দীর্ঘ বিরতির পর, ১৯০৮ সালে প্রকাশিত শারদোৎসবের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাটকের এক নতুন পর্ব শুরু হবে। সে পর্যায়ে যাবার আগে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নিরিখের দিক থেকে দেখছি, রবীন্দ্রনাথ নাটক লেখা শুরু করেছেন সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় এবং প্রয়োগভঙ্গিকে আশ্রয় করে, খুবই আশ্চর্যজনকভাবে, সেখানেও কিন্তু কোনও পুনরাবৃত্তি নেই। দ্বিতীয়ত, বিষয়ের নির্বাচনে তিনি ইতিহাস পুরাণের চেনা আখ্যানকে গ্রহণ করছেন না কখনও, বিসর্জন নাটকে ত্রিপুরার ইতিহাসকে অবলম্বন করলেও, তাকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিচ্ছেন, যার মধ্য দিয়ে জীবন বা ধর্ম সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কোনও একটি বীক্ষা বা প্রণবতা বেরিয়ে আসতে পারে। প্রথাগত নাট্যবিষয় এবং নির্মাণরীতির সঙ্গে সংঘাত হলে তাকে তিনি পরিত্যাগ করতে চাইছেন, প্রতিষ্ঠানস্বীকৃত বলে মেনে নিচ্ছেন না।

শারদোৎসব পর্ব নিয়ে আলোচনা শুরু করবার আগে আরো কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। এক, উনিশ শতকের শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ বাঙলাদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন, জমিদারি পরিদর্শনের সুযোগে একদিকে

যেমন পরিচিত হয়েছেন নির্বাধ প্রকৃতির ঐশ্বর্যময় রূপবদলের সঙ্গে, অন্যদিকে আবার সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, তাদের সাহিত্য শিল্প বা তাদের ধর্ম সংস্কৃতির বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। সেই সঙ্গে মন দিয়ে পড়ছেন সংস্কৃত সাহিত্য, ছিন্নপত্রের চিঠিতে তার প্রমাণ আছে। দেশকে চেনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠছে তাঁর ভাবনায়, নতুন শতাব্দীর আরম্ভে যার প্রকাশ ঘটবে তাঁর শিক্ষাচিন্তায়, স্বদেশচিন্তায়, 'গোরা' বা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে। দেবীপদ ভট্টাচার্য বিশেষ করে বলেতে চেয়েছেন, তাঁর সামনে ছিল আয়ারল্যান্ডের অ্যাবে থিয়েটারের উদাহরণ (প্রতিষ্ঠা ১৯০৪), যা সে দেশের মানুষ তাঁদের নিজস্ব শিকড়ের উপাদান দিয়ে গড়ে তুলতে চাইছিলেন। বস্তুত, ১৯০৭ সালে এক সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বই বেরোবে, শতাব্দীর শুরুতে লেখা কিছু প্রবন্ধের সংকলন, তারা হল 'প্রাচীন সাহিত্য' (২৩ জুলাই), 'লোকসাহিত্য' (২৬ জুলাই), 'আধুনিক সাহিত্য' (১০ অক্টোবর), 'সাহিত্য' (১১ অক্টোবর)। লক্ষ করবার, এর মধ্যে কিন্তু বিদেশি সাহিত্য বিষয়ে কোনও রচনার সংকলন নেই। বলতে চাই, সাহিত্যের দেশজ উৎসগুলিকে নিয়ে ভাবছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাদের সামাজিক তাৎপর্য আর প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য বুঝে নিতে চাইছিলেন।

এর একটি ফল যেমন লোকসাহিত্যের বা সংস্কৃতির সংগ্রহে তাঁর উৎসাহ, তেমনি আবার সংস্কৃত নাটক বিষয়ে আগ্রহ, যার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটল ১৯০২ সালে প্রকাশিত রঙ্গমঞ্চ প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে তিনি বিলেতি রিয়ালিজমকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, নিয়ে আসতে চাইছেন ধ্রুপদী ভারতীয় নাটকের ধরে নেওয়ার বা make belive-এর জগৎকে। এই পর্ব থেকে রবীন্দ্রনাটকে যে ধরন শুরু হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্যগুলি হল— (ক) লোকজীবন, লোককৃত্য বা রিচুয়ালের ধরনকে নিয়ে আসছেন পরিশীলিত ভঙ্গিতে, তৈরি হয়ে উঠছে নতুন এবং রাবীন্দ্রিক এক কৃত্য বা রিচুয়ালের রূপ। শান্তিনিকেতন আশ্রমের জীবনচর্যার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগের প্রবণতা সহজেই ধরতে পারা যাবে, (খ) প্রকৃতির ঋতুবদল কেবলমাত্র পশ্চাৎপট হিসেবে নয়, প্রভাবময় চরিত্র হয়ে উঠছে, তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হয়ে উঠছে নাটকের অন্যতম বিষয়। মনে রাখতে চাই, পৃথিবীর সব দেশের রিচুয়াল বা কৃত্যের সঙ্গে খুব স্বাভাবিক কারণেই প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। (গ) বাস্তবের, বা বলা ভালো সম্ভাব্যতার পরিধিকে অতিক্রম করে যাচ্ছেন, এমন কিছু ঘটনা আনছেন যা ঘটার কথা নয়, এমন কিছু চরিত্র আছে আমাদের পৃথিবীতে যাদের দেখা পাওয়া যায় না। তবে একথাও মনে রাখতে বলব, তারা কখনওই সম্পূর্ণ অলীক হয়ে থাকছে না, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের কিছু মায়া যেন লেগে থাকছে তাদের শরীরে। প্রথাগত নাটকের ধাঁচায় হয়তো সংঘাত তৈরি করছে না, কিন্তু গহন কিছু লোকমোটিফ, চরিত্রে বা ঘটনায়। আমাদের দেশজ লোককাহিনির সঙ্গে এদর সম্পর্ক আছে, ঠিক তেমনি আবার মনে রাখতে বলব, য়ুরোপে উনিশ শতকের শেষ পর্বে রিয়ালিজ্‌মকে সরিয়ে রেখে জেগে উঠছিল সিম্‌বলিজমের যুগ, যার বৈশিষ্ট্য হল, ...symbolist drama was a movement of late nineteenth and early twentieth centuries which sought to replace realistic representation of life with the expression of an inner truth... symbolism used myth, lagend, and symbols in an attempt to reach beyond everyday reality. তার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাটকের ধাঁচাকে মিলিয়ে দেখা সম্ভব। 'ফাল্গুনী', 'কলের যাত্রা' আর 'তাসের দেশ' ছাড়া আর কোনও রবীন্দ্রনাটককে রূপক কোনওভাবেই বলা যাবে না, বাইরের অর্থকে স্বচ্ছ রেখে ভেতরের অর্থকেই চূড়ান্ত করে তোলা যদি হয় allegory-র বৈশিষ্ট্য, তাঁর বাকি নাটকগুলি তার মধ্যে পড়ে না। আর সাংকেতিক শব্দ ব্যবহারের কোনও অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট নয় কেন না আমরা জানি যে-কোনও প্রকাশই আসলে সংকেত তাই সাংকেতিক নাটক কথাটির কোনও মানে হতে পারে না।

শারদোৎসব, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর—চারটি নাটকেই মানুষের গল্পের সঙ্গে পশ্চাৎপট হয়ে চলে আসছে ঋতুবদলের আখ্যান, প্রথম দুটি নাটকে কোনও না কোনও উৎসবের রূপ ধরে, পরের দুটিতে পটভূমি হিসেবে। ফাল্গুনী নাটকে রবীন্দ্রনাথ মানুষের বাইরের ও ভেতরের নানা সংঘাতকে সরিয়ে দিয়ে প্রকৃতিকেই মুখ্য করে তুললেন, এখানে চরিত্রগুলি স্বতন্ত্র্য পরিচয়হারা, একমেটে, অনেক সময় তাদের নামকরণের প্রয়োজনও বোধ করা হয়নি। মূল নাটকটি প্রকাশিত হবার দশ মাস পরে তিনি এর সঙ্গে একটি সূচনাপর্ব জুড়ে দিলেন, সেখানে আছে যৌবন চলে যাবার ভয়ে ভীত এক রাজার গল্প, তাঁকে জীবনের লীলা বোঝাবার জন্য কবিশেখর তাঁকে অভিনয় করে দেখাচ্ছেন ফাল্গুনী নাটকটি। সমকালে প্রকাশিত বলাকা কাব্যগ্রন্থের আলোচনায় বের্গসঁর গতিতত্ত্বের কথা ওঠে, ফাল্গুনীর মধ্যে তার প্রভাব স্পষ্ট। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বেশ ক'টি নাটক লিখবেন, নিসর্গনাটক বা ঋতুনাটক নামে যাদের পরিচয় হবে, সেখানে আদিম লোকবিশ্বাস বা কৃত্যের রূপ চলে আসবে তাঁর নাটকের মধ্যে। প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে একে প্রবলভাবে ভারতীয় কথনরীতির অনুসারী বলে মনে হয়, যেখানে কবিরা রাজসভায় বসে কোনও কাব্য পাঠ করতেন, এবং হয়তো সে পাঠের মধ্যে অভিনয়ের স্বাধীনতাও নিতেন। ড্রামাটিক ন্যারেশনের এই ধরনের পরীক্ষা বাঙলা নাটকে আর কেউ এত ব্যাপকভাবে করেছেন বলে মনে পড়ে না।

১৯১৬ সালে ফাল্গুনী, তারপর দীর্ঘদিন রবীন্দ্রনাথ নতুন কোনও নাটক লিখছিলেন না, পুরনো, অথবা তত পুরনো নয় এমন কিছু নাটককে নতুন করে সাজাচ্ছিলেন, আর প্রচুর অনুবাদ করছিলেন, যে অনুবাদ বিষয়ে তাঁর

ভক্তরাও যে সকলে খুব মুগ্ধ হতে পারছিলেন এমন নয়। আমাদের ভাবতে ইচ্ছে করে, প্রতীচ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ার সূত্রে কি রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী য়ুরোপ বা আমেরিকা সম্পর্কে আগের তুলনায় বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন? বিশেষত নাটক রচনায় যে বন্ধতার মধ্যে আটকে পড়েছিলেন তিনি, তার থেকে বেরিয়ে এসে নতুন বিষয়ে আর প্রকাশরীতি খুঁজে পাওয়ার জন্য দরকার ছিল প্রবল ধাক্কা, রবীন্দ্রনাথের লেখা নাটকের পটভূমি হয়ে এসেছে তাঁর নিজের দেশ, সে দেশের প্রকৃতি, তাঁর স্বদেশবাসী মানুষজনের আদল, এবং সর্বোপরি, তাঁর ব্যক্তি আমির অবয়ব। মুক্তধারা থেকে পরপর তিনটি নাটকে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্যাকে নিয়ে আসছেন তা যেমন তাঁর স্বদেশের তেমনি বিদেশের, পাশ্চাত্য আধুনিকতার যে রূপ তিনি দেখেছেন, যার প্রবল সমালোচনা করে বিরাগভাজন হচ্ছেন, এবং যার প্রকাশ নিজের দেশেরও দেখতে পাচ্ছেন, তার বিরুদ্ধেই কথা বলছে এই নাটকগুলি। মুক্তধারা শিবতরাইকে কেবলমাত্র ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ হিসেবে ভাবলে চলবে না, সাম্রাজ্যবাদ কেমন করে প্রযুক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে অন্য দেশেকে শোষণ করে, কেমন করে শিক্ষায়, জীবনাচরণে এমন কি লোকপুরাম বা মিথ্যের মধ্যেও ঢুকিয়ে দেওয় সাম্রাজ্যবাদের বিষ, তার খুব বিশ্বাসযোগ্য ছবি পাই মুক্তধারায়। রক্তকরবী বা কালের যাত্রাও কেমন করে একটি যুগান্তরের পৃথিবীকে ধরছে তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবার সময়ও আমাদের নেই, আমি শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যনিরিখের শর্ত মনে রেখে এদের সাধারণ দু-একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে চাই।

বিষয়টি আন্তর্জাতিক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একটা দেশ পটভূমি তৈরি করছেন। বস্তুত, বিদেশের পটভূমিতে সাহিত্য রচনা করতে কিনি কখনওই স্বস্তি বোধ করতেন না, নাটকের বেলাও তার অন্যথা হয়নি। এতবার বিদেশে গেছেন, মিশেছেন, দেখেছেন, তার প্রায় কোনও প্রত্যক্ষ ছাপ তার পটভূমি নির্মাণে পড়েনি। এর ফলে তাঁর নাটক একধরনের আবহমানতার মাত্রা পায়, পুরাকালের আখ্যানের কাঠামোয় আধুনিক সমস্যা বৈপরীত্যের তীব্রতা তৈরি করে। এই পর্বের নাটকগুলিকে বুঝতে গেলে সমকালে লেখা ইংরেজি প্রবন্ধ গুলি পড়া দরকার, যেমন Creative Unit বা Talks in China, পড়া দরকার প্রিয় ভক্ত ও বন্ধু এন্ড্রুজকে লেখা চিঠির সংকলন Letters to of friend. ভাবনার মিলের বাইরেও দেখা যাবে, ই সব লেখায় ব্যবহৃত বহু উপমা শরীর নিচ্ছে নাটকগুলির মধ্যে। পাশাপাশি এ কথাও মনে রাখতে চাই, বিশ্বযুদ্ধ পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গিকে নানাভাবে পালটে দিচ্ছিল, রিয়ালিজ্‌ম ন্যাচারলিজ্‌ম সিমবলিজমের যুগ পার হয়ে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জার্মানিতে এসেছেন জর্জ কাইজার বা আনঅস্ট টোলার, শুরু হয়েছে এক্সপ্রেশনিস্ট নাটকের ধারা। ১৯২০ সালে প্রকাশিত টোলারের Masses and the Man নাটকের কাহিনিবৃত্তের সঙ্গে রক্তকরবীর কিছু আপাত মিল পাওয়া সম্ভব। আজ একথা ভেবে একটু মজাই লাগতে পারে যে, যোগেশ চৌধুরীর মতো তরুণ নাটককার যখন নাটকে উনিশ শতকীয় ইবসেনের টেকনিক ব্যবহার করার ঘোষণা করছেন ভূমিকায়, ষাটোর্ধ রবীন্দ্রনাথ তখন য়ুরোপের আধুনিকতম নাট্যশৈলীকে নিজের মতো করে প্রয়োগের দক্ষতা এবং সাহস দেখাতে পারছেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যনিরিখের আলোচনায় প্রাচ্য বলতে কেবলমাত্র ভারতীয় থিয়েটারকেই বোঝানো সংগত হবে না। প্রমথনাথ বিশি লক্ষ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের নাটকে ক্রমেই গানের পরিমাণ বাড়ছিল। সেই সূত্রে সিদ্ধান্ত করি, তিনি ক্রমশই ঘটনা বা তথ্যের জগৎ থেকে সরে আসতে চাইছিলেন আবেগের দিকে, যার প্রকাশ ঘটতে পারে সুরের মধ্য দিয়ে। ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভ্রমণ করতে যান। জাভা ও বালির নৃত্যগীত তাঁকে প্রভাবিত করে। বাণীহীন সেই নৃত্যরীতিকে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্যে পরিণত করলেন। সংগীত যদি হয় কথার অতিরেকময় রূপ, তবে তার যোগ্য হতে গেলে শরীর সঞ্চালনেও থাকা চাই সেই শৈল্পিক অতিরেক, তার প্রকাশ নাচে। জীবনের শেষ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ এর চর্চায় সময় দিয়েছেন বেশি।

রবীন্দ্রনাটকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যনিরিখ নিয়ে সর্বার্থেই অসম্পূর্ণ এই আলোচনা আমাদের একটি সত্যের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। বাস্তব কারণেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে নানা ধরনের নাট্যবিষয় এবং শৈলীর মুখোমুখি হতে হয়েছে, তার অনেক কিছুকে গ্রহণও করেছেন, কিন্তু তাদের করে তুলেছেন নিজের শৈলীর অনুসারী, তাই, আলাদা করে তাদের চোখে পড়ার উপায় নেই।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগ আয়োজিত সেমিনারে পঠিত।